দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ। এদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন বছরের পর বছর ফসল উৎপাদন করতে পারি, তেমনি একটি দেশে নতুন ফসল আত্তীকরণ ও সংযোজন করতে পারি, একটি ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ ধরে রাখতে পারি এবং নানা জীব কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উন্নততর করে তুলতে পারি।

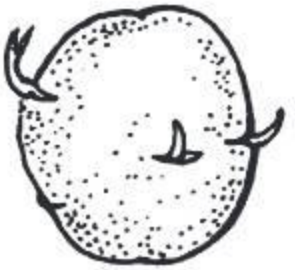

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ ও ধাপগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছের পুকুরের স্বরূপ ও পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- মাছের পুকুর প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পুকুরের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ও বাস্তুসংস্থান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্থায়ী মৌসুমী ও আঁতুড় পুকুর বর্ণনা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছের অভয়াশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছের আবাসস্থল রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গৃহপালিত পাখির আবাসন স্বরূপ এবং আবাসন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- গৃহপালিত পাখির আবাসন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গৃহপালিত পাখির খাদ্য এবং খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গবাদি পশুর খাদ্য ও খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- গবাদি পশুর খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণ

বীজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারের প্রধান মাধ্যম। সাধারণভাবে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে আমরা বীজকে দুইভাবে বুঝতে পারি। যথা-

ক) উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে, উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। এ ধরনের বীজকে ফসল বীজ বা প্রকৃত বীজ বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজও বলে। যেমন: ধান, গম, সরিষা, তিল, শিম, বরবটি, টমেটো, ফুলকপি, মরিচ, জিরা, ধৈঞ্চা, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

খ) কৃষিতত্ত্ব অনুসারে উদ্ভিদের যেকোনো অংশ (মূল, পাতা, কাণ্ড, কুঁড়ি, শাখা) যা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে বংশবিস্তারক উপকরণ বলে। এ ধরনের উপকরণকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বা অঙ্গজ বীজও বলা হয়। যেমন : আমের কলম, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ্ড, পাথরকুচি গাছের পাতা, কাকরোলের মূল, গোলাপের ডাল ও কুঁড়ি, আনারসের মুকুট, কলাগাছের সাকার, আদা, হলুদ, রসুন, কচু ও সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ। গ

কাজেই দেখা যায় সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সকল কৃষিতাত্ত্বিক বীজ উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা ধান, গম, মুলা, মরিচ ফসলের এবং আলু, আদা, গাঁদা ফুল ও মেহেদির কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে জমা দেবে।

ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হলো এই যে, বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন- ধান, পাট, গম, মুলা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহের বিশেষ যত্নবান হতে হয় :

১। **বীজ জমি নির্বাচন :** বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলো-বাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।

২। **বীজ জমি পৃথকীকরণ :** বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

ক) জাতের নাম
খ) বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর
গ) অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ) বীজের আর্দ্রতা
চ) বীজ পরীক্ষার তারিখ

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের বস্তায় বা প্যাকেটে রাখা হয়।

৪। **বীজের হার নির্ধারণ :** বীজের বিশুদ্ধতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।

৫। **নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ :** এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাক্ত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।

৬। **বীজ বপন :** নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির উপর নির্ভর করে।

৭। **রোগিং বা বাছাইকরণ :** বীজ বপনের সময় যতই বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিন পর্যায়ে রোগিং বা বাছাই করা হয়।

ক। ফুল আসার আগে খ। ফুল আসার সময় গ। পরিপক্ব পর্যায়ে

৮। **পরিচর্যা :** বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যার ধরন উল্লেখ করা হলো :

ক) সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা
খ) জৈব সার প্রয়োগ
গ) প্রয়োজনমতো সেচ দেওয়া
ঘ) বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ) আগাছা পরিষ্কার করা
চ) রোগ ও পোকা দমন করা
ছ) সারের উপরি প্রয়োগ করা।

৯। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ পরিপক্ব হওয়ার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বাংলাদেশে ফুল ও ফলের চারা অঙ্গজ পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রচলন খুব বেশি। কারণ এসব গাছের বংশবিস্তার প্রকৃত বীজের মাধ্যমে হলে ফুল ফল পেতে সময় বেশি লাগে ও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এ ছাড়া অনেক ফসলের প্রকৃত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার ঘটানোও সম্ভব নয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখা প্রভৃতি দ্বারা দ্রুত ও অল্প সময়ে চারা উৎপাদন সম্ভব। তাই এগুলো হলো ফসলের বংশবিস্তারক উপকরণ। কিছু কিছু ফসল যেমন– আনারস, কলা, আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির বংশবিস্তারক উপাদান সরাসরি রোপণ করা যায়। আবার কিছু ফসল যেমন– আম, লেবু, লিচু, জামরুল, গোলাপ ইত্যাদির বংশবিস্তারক উপাদান বিভিন্ন ধরনের কলম তৈরির মাধ্যমে প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয়। নিম্নে

বংশবিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজ হিসাবে বীজ আলু উৎপাদনের ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো:

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও তৈরি : বীজ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। নির্বাচিত জমি অন্যান্য ফসল যেমন- মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি সোলানেসি গোত্রভুক্ত ক্ষেত থেকে অন্তত ৩০ মিটার দূরে থাকতে হয়। ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা করে আগাছা মুক্ত করতে হবে। চাষ অন্তত ১৫ সেমি গভীর হতে হবে। মাটি বেশি শুকনো হলে প্লাবন সেচ দিয়ে মাটিতে 'জো' আসার পর আলু লাগাতে হবে।

বীজ শোধন : হিমাগারে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (১ লি. পানি + ৩০ গ্রাম বরিক পাউডার মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)।

বীজ প্রস্তুতি : বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্ত আলু বপন করা ভালো, কারণ আস্ত বীজ রোপনের পর এগুলোর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। আলু কেটে লাগালে প্রতি কর্তিত অংশে অন্তত ২টি চোখ অবশ্যই রাখতে হবে। আলু কাটার সময় বারবার সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়িভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হবে।

মাটিতে ঔষধ প্রয়োগ : ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য শেষ চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেবল ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরোপিক্সিন মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া উত্তম।

সার প্রয়োগ : দুটি কারণে আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। প্রথমত সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভালো হয়। দ্বিতীয়ত গাছে কোনো খাদ্যোৎপাদনের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে আলু চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, বরিক পাউডার জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতাংশে
কম্পোস্ট সার	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম
এমওপি	১০৬০ গ্রাম
বরিক পাউডার/ বোরন সার	২৫ গ্রাম
জিঙ্ক সালফেট	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	-

বীজ হার ও রোপণ সময় : বীজ হার নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব ও বীজের আকারের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলুর প্রয়োজন (একরে ৬০০-৮০০ কেজি)।

রোপণ দূরত্ব

দূরত্ব	আস্ত আলুর ক্ষেত্রে	কাটা আলুর ক্ষেত্রে
লাইন থেকে লাইন দূরত্ব	৬০ সেমি	৬০ সেমি
বীজ থেকে বীজ দূরত্ব	২৫ সেমি	১০-১৫ সেমি

সেচ ব্যবস্থাপনা : মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ প্রদান করা উচিত। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্কুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাবে। রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে কারণ ৩০ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হতে শুরু করে। সাধারণত কেইলের ২/৩ ভাগ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন : রোপণের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। সাধারণত গাছ ছোট থাকাকালীন অবস্থায় আগাছা যথাসম্ভব দমন করে রাখতে হবে। এছাড়া বথুয়া জাতের আগাছা যা ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসাবে কাজ করে তা অবশ্যই নির্মূল করে ফেলতে হবে।

মাটি উঠিয়ে দেওয়া : ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে 'জো' আসলে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরও এক বার এমনভাবে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে আলু বাহিরে না যায় এবং স্টোলন ও আলু মাটির ভিতরে থাকে।

রোগিং: চারা গজানোর পর থেকে রগিং শুরু করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ শিকড়সহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগবালাই ও পোকা দমন

(ক) আলুর রোগ : আলুর রোগসমূহের মধ্যে মড়ক রোগ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ, দাঁদ রোগ, কাণ্ড পচা রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (লেইট ব্লাইট) আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আলু ফসলকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য ছত্রাকনাশক নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

খ) কাটুই পোকা : এ পোকার কীড়া আলুর প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা গাছ কেটে দেয় এবং আলু আক্রমণ করে।

- খুব সকালে যে সব গাছ কাটা পাওয়া যায় সেগুলোর গোড়ার মাটি সরিয়ে পোকার কীড়া বের করে মারতে হবে।
- আক্রমণ তীব্র হলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গ) জাব পোকা : জাব পোকা গাছের রস খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাব পোকা দমন অত্যন্ত জরুরি। এজন্য গাছের পাতা গজানোর পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ এড়াতে ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই আলু সংগ্রহ করা উত্তম।

ফসল সংগ্রহ এবং পরিচর্যা : আধুনিক জাতে পরিপক্বতা আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। তবে বীজ আলুতে সংগ্রহের অন্তত ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ক) হাম পুলিং : মাটির উপরের গাছের সম্পূর্ণ অংশকে উপড়ে ফেলাকে হাম পুলিং বলে। আলু সংগ্রহের ৭-১০ দিন পূর্বে হাম পুলিং করতে হবে। এতে সম্পূর্ণ শিকড়সহ গাছ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচে থেকে যাবে। হাম পুলিং এর ফলে আলুর ত্বক শক্ত হয়, রোগাক্রান্ত গাছ থেকে রোগ বিস্তার কম হয় ও আলুর সংরক্ষণগুণ বৃদ্ধি পায়। বীজ আলুতে অবশ্যই হাম পুলিং করতে হবে, তবে খাবার আলুর বেলায় হাম পুলিং জরুরি নয়।

(খ) আলু উত্তোলন : আলু উত্তোলনের পর পরই বাড়িতে নিয়ে আসা উত্তম। আলু তোলার পর কোনো অবস্থাতেই ক্ষেতে স্তুপাকারে রাখা যাবে না, কারণ ক্ষেতে আলু খোলা রাখলে তা বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে (যেমন-সুতলি পোকা ডিম পাড়তে পারে)।

(গ) আলু সংরক্ষণ : আলু উত্তোলনের পর বাড়িতে এনে সাথে সাথে কাটা, দাগি ও পচা আলু আলাদা করে বেছে ফেলতে হবে। তারপর ৭-১০ দিন মেঝেতে আলু বিছিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর আবারও দাগি ও পচা আলু বেছে বাদ দিয়ে ভালো আলু বস্তায় ভরে হিমাগারে পাঠাতে হবে।

এছাড়া বীজ আলু উৎপাদনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন–

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি
(খ) স্প্রাউট ও টপ শুট কাটিং পদ্ধতি
(গ) বিনাচাষে বীজ আলু উৎপাদন
(ঘ) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।

ফসল বীজের গুরুত্ব : ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সব ফসল কেবল বীজের মাধ্যমেই ফলানো সম্ভব সে ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বংশরক্ষার্থে ফসল বীজের বিকল্প নেই। এছাড়াও-

১। ফসল বীজ ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ।
২। ফসল বীজ মানুষসহ পশু পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩। বিশুদ্ধ ফসল বীজ রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা বিস্তার রোধ করে।
৪। ফসল বীজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব।
৫। ফসল বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশধারা টিকে থাকে।
৬। কোনো কোনো বীজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৭। ফসল বীজ অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব : অধিকাংশ ফসলের বংশবিস্তার বীজ দ্বারা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ফলন পাওয়া যায়। কাজেই জনবহুল কোনো দেশের জন্য ফসল দ্রুত পাওয়ার জন্য বংশবিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজের বিকল্প নেই। এতে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, শিকড়, কুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে বংশবিস্তার করা হয় বলে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে। একই গাছে একাধিক জাতের সংযোজন ঘটানো যায়। যেমন : মিষ্টি ও টক কুল একই গাছে এবং লাল, হলুদ, কালো ও সাদা ফুল একই গোলাপ গাছে ফোটানো সম্ভব। এছাড়াও এ উপকরণ ব্যবহার করে বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অল্প সময়ে ও কম খরচে সহজে ফুল, ফল পাওয়া যায়। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি উৎপাদনে ফসল বীজ সংগ্রহ করবে এবং বীজের বর্ণনা খাতায় লিখবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাছের পুকুর

পুকুর হচ্ছে ছোট ও অগভীর বদ্ধ জলাশয়, যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা যায় এবং প্রয়োজনে এটিকে সহজেই সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলা যায়। এককথায় পুকুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের বাসস্থান। পুকুরে পানি স্থির অবস্থায় থাকে। তবে বাতাসের প্রভাবে এতে অল্প ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক এবং এই ধরনের পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল হয়।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

মাছ চাষের পুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যা চাষ প্রক্রিয়াকে লাভজনক করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

১। পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হতে হবে।

২। পুকুরের মাটি দোআঁশ, পলি-দোআঁশ বা এঁটেল-দোআঁশ হলে সবচেয়ে ভালো।

৩। সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত।

৪। পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২ মিটার সুবিধাজনক।

৫। পুকুরটি খোলামেলা স্থানে হলে ভালো হয় এবং পাড়ে কোনো বড় গাছপালা না লাগালে ভালো হয়। এতে পুকুর প্রচুর আলো-বাতাস পাবে। ফলে পুকুরে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হবে ও মাছের খাদ্য বেশি তৈরি হবে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মিশবে। উত্তর-দক্ষিণমুখী পুকুর সূর্যালোক বেশি পাবে।

৬। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকা উচিত নয়। তলার কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সেমির বেশি হওয়া ঠিক নয়।

৭। চাষের পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। পুকুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ভালো। এতে করে জাল টেনে মাছ আহরণ করা সহজ হয়।

৮। পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ পুকুরের তলা হতে পুকুরের পাড় যতটুকু উঁচু হবে পাড় ঢালু হয়ে পুকুরের তলার দিকে দ্বিগুণ দূরত্বে গিয়ে মিশবে।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ

মাছের বেঁচে থাকা, খাদ্যগ্রহণ ও আশানুরূপ বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় থাকা দরকার। পুকুরে পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ভৌত গুণাগুণ ২) রাসায়নিক গুণাগুণ। মাছ চাষে এদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো -

১। ভৌত গুণাগুণ

ক) **গভীরতা:** পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যের আলো পুকুরের অধিক গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে অধিক গভীর অঞ্চলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংকটন তৈরি হয় না। আবার সেখানে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। অন্যদিকে পুকুর অগভীর হলে গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। এসব কারণে মাছের ক্ষতি হতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

খ) **তাপমাত্রা:** তাপমাত্রার বৃদ্ধির উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন– শীতকালে মাছ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয় ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়।এ কারণে শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো হয়।

গ) **ঘোলাত্ব:** কাদা কণার কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ঘ) **সূর্যালোক:** যে পুকুরে সূর্যালোক বেশি পড়ে সেখানে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। ফলে সেখানে ফাইটোপ্লাংটন বেশি উৎপাদিত হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২। রাসায়নিক গুণাগুণ

ক) **দ্রবীভূত অক্সিজেন:** পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত ফাইটোপ্লাংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত হয়। বায়ুমণ্ডল হতে সরাসরি পানির উপরিভাগেও কিছু অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। পুকুরে বসবাসকারী মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সূর্যালোকের অভাবে সালোকসংশ্লেষণ হয় না বলে পানিতে কোনো অক্সিজেন তৈরি হয় না। এজন্য সকালে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও বিকেলে বেশি থাকে। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ মিলি গ্রাম/লিটার (৫ পিপিএম বা ১ মিলিয়ন ভাগের পাঁচ ভাগ) থাকা প্রয়োজন।

খ) **দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড:** পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকা প্রয়োজন। তবে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ১২ মিলি গ্রাম/লিটারের (১২ পিপিএম) নিচে থাকলে তা মাছ ও চিংড়ির জন্য বিষাক্ত নয়। মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরের পানিতে ১-২ পিপিএম কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকা প্রয়োজন।

গ) **পিএইচ (P^H):** পুকুরের পানির P^H মান নির্ণয় করে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রা বোঝা যায়। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির P^H ৬.৫ হতে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। P^H ৪ এর নিচে বা ১১ এর উপরে হলে মাছ মারা যায়। পানির P^H কমে অম্লীয় হয়ে গেলে পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক) প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে P^H বেড়ে ক্ষারীয় অবস্থা বেশি বেড়ে গেলে এমোনিয়াম সালফেট বা তেঁতুল পানিতে গুলে পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) **ফসফরাস:** প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপ্লাংটন জন্মায়।

পুকুরের প্রকারভেদ ও এর বিভিন্ন স্তর

পুকুরের প্রকারভেদ

পানি ধারণক্ষমতা, পুকুরে মাছের ধরন, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে পুকুরের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো -

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণিবিভাগ

ক) **স্থায়ী বা বার্ষিক পুকুর:** এসব পুকুরে সারা বছর পানি থাকে। এ ধরনের পুকুর অধিক গভীর হয়। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে। যেমন- এঁটেল ও দোঁআশ মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদির মিশ্র চাষ, গলদা চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ করা যায়।

খ) **অস্থায়ী বা মৌসুমি পুকুর:** এসব পুকুরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮মাস) পানি থাকে। এগুলো বেশি গভীর হয় না। এদের মাটি বেশি সময় পানি ধরে রাখতে পারে না। যেমন- বেলে মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ যেগুলো এক বছরের কম সময়ে বাজারজাত করার উপযোগী হয় সেসব মাছ চাষ করা যায়। যেমন- সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, শিং, মাগুর ইত্যাদি।

২। চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

মাছের পোনাকে বয়স ও দৈর্ঘ্য অনুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম পোনা, রেণু পোনা, ধানী পোনা ও আঙুলে বা চারা পোনা। ডিম ফোটার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে। এদের পেটের নিচে একটি থলি থাকে। থলি থাকা অবস্থায় (২-৩দিন) এরা বাইরে থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। কুসুম থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেণু পোনা বলে। রেণু পোনা আরও বড় হয়ে ধানের মতো আকার (যেমন - ২ বা ২ সেমি এর উপর) হলে একে ধানী পোনা এবং আঙুলের মতো লম্বা (৭ সেমি এর উপর) হলে একে আঙুলে বা চারা পোনা বলে। বিভিন্ন আকারের পোনার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশের পুকুর প্রয়োজন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো -

ক) **আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর:** যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর বলে। এখানে শতক প্রতি ৫০-১০০ গ্রাম রেণু পোনা ছেড়ে ১৫-৩০ দিন চাষ করা হয়।

খ) **লালন পুকুর:** যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা বা আঙুলে পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। লালন পুকুরের আয়তন ২০ থেকে ১০০ শতক ও গভীরতা ১.৫-২ মিটার হতে পারে। এ পুকুরে শতক প্রতি ২৫০০-৪০০০টি ধানী পোনা ছেড়ে ২-৩ মাস চাষ করা হয়।

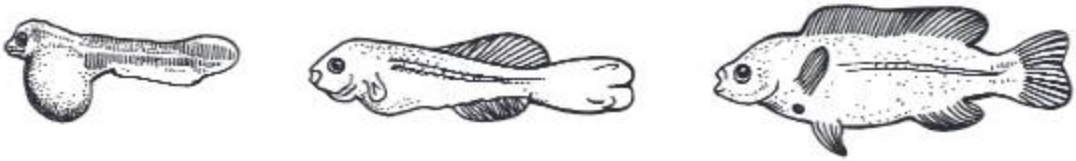

ডিম পোনা ধানী পোনা চারা পোনা / আঙুলে পোনা

চিত্র : মাছের পোনার বিভিন্ন পর্যায়

গ) **মজুদ পুকুর:** এটিই মাছ চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে ধানী বা আঙুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এর আয়তন ৩০ শতকের উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। এখানে সাধারণত ১ বছরের উপরে মাছ লালন না করাই ভালো। কারণ খাদ্য দিলেও এ সময়ের পর মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।

এছাড়া আয়তনের উপর ভিত্তি করেও পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর (১-৫ শতক), মাঝারি পুকুর (১০-৩০ শতক) এবং বড় পুকুর (৩০ শতকের উপর)।

পুকুরের বিভিন্ন স্তর

পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে তাপমাত্রা, অক্সিজেন, ও প্লাংকটনের তারতম্য ঘটে। পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন মাছ ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে। এই সব তারতম্য অনুযায়ী পুকুরকে ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- (১) উপরের স্তর (২) মধ্যস্তর এবং (৩) নিচের স্তর

১) **উপরের স্তর বা উপরিভাগ:** পুকুরের উপরের স্তর যেহেতু বাতাসের সংস্পর্শে থাকে তাই এই স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পুকুরের উপরের স্তরে ফাইটোপ্লাংকটন বেশি থাকে, যা মাছের খাদ্য। এই স্তরে সরপুঁটি, কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

২) **মধ্যস্তর বা মধ্যভাগ:** এই স্তরে পানির তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জু-প্লাংকটন থাকে তবে ফাইটোপ্লাংকটনও থাকতে পারে। রুই মাছ এই স্তরে থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

৩) **নিচের স্তর বা তলদেশ:** এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। পুকুরের তলদেশে জু-প্লাংকটন, কীটপতঙ্গের লার্ভা, জৈব-আবর্জনা, কেঁচো, শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়। মৃগেল, কালবাউশ, কার্পিও বা কমন কার্প, চিংড়ি, পাঙ্গাশ, শিং, মাগুর এই স্তরে বাস করে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরেই বিচরণ করে যেমন- তেলাপিয়া। অন্যদিকে গ্রাস কার্প পুকুরের উপরে, পাড়ে বা তলদেশে জন্মানো বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

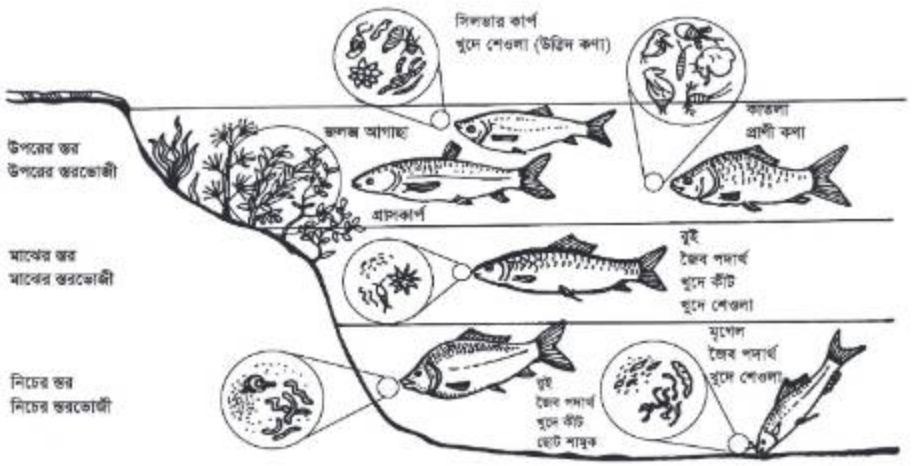

চিত্র: পুকুরের বিভিন্ন স্তর

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুকুরে স্তর ভিত্তিক মাছের অবস্থান ও তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর, মজুদ পুকুর, বার্ষিক ও মৌসুমি পুকুর

পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা জীবকুলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) **প্লাংকটন:** প্লাংকটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান আণুবীক্ষণিক জীব। এরা দুই প্রকার যথা- ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদকণা ও জু-প্লাংকটন বা প্রাণিকণা। পুকুরের পানির রং সবুজ বা সবুজাভ থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন আছে। ফাইটোপ্লাংকটনকে এককোষী শেওলাও বলে। কয়েকটি ফাইটোপ্লাংকটনের উদাহরণ হচ্ছে- ক্লোরেলা, এনাবেনা, মাইক্রোসিস্টিস ইত্যাদি। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জু-প্লাংকটন হচ্ছে ড্যাফনিয়া, কপিপোড, রটিফার। পানির রং বাদামি সবুজ, লালচে-সবুজ বা হলদেটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটোপ্লাংকটনের পাশাপাশি পুকুরে জু-প্লাংকটনের উপাদানও ভালো। পুকুরে প্লাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয়। সার হিসাবে জৈব ও অজৈব এ দু-ধরনের সারই ব্যবহার করা যায়।

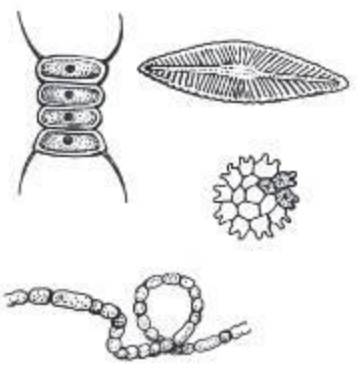

চিত্র: কয়েকটি ফাইটোপ্লাংকটন

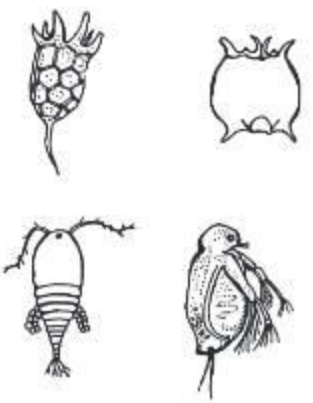

চিত্র: কয়েকটি জু-প্লাংকটন

২) **সাঁতারু বা নেকটন:** এরা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এরা সমস্ত পানিতে চরে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে খায় যেমন- মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি। অবশ্য এদের ডিম ও লার্ভার বৈশিষ্ট্য প্লাংকটনের মতো।

৩) **তলবাসী বা বেনথোস:** পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যেসব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেনথোস বলে। যেমন- পচনকারী ব্যাকটেরিয়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। তলবাসী প্রাণী পুকুরের তলা থেকে প্লাংকটনের পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে। ফলে পানিতে প্লাংকটনের পুষ্টি উপাদান বাড়ে যা মাছ চাষের জন্য ভালো।

৪) **জলজ উদ্ভিদ:** পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন–

ক) **শেওলা:** অগভীর পুকুরের তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে। যেমন–স্পাইরোগাইরা।

খ) **ভাসমান উদ্ভিদ:** এ সকল উদ্ভিদ পানিতে ভেসে থাকে। এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে না। যেমন– কচুরিপানা, টোপাপানা, খুদিপানা ইত্যাদি।

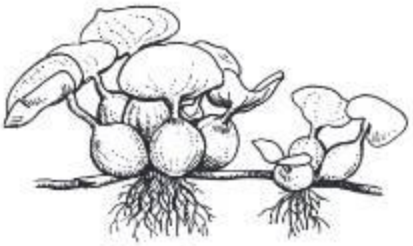

চিত্র:কচুরি পানা

চিত্র: খুদি পানা

গ) **নির্গমশীল উদ্ভিদ:** এ সব উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে। যেমন– শাপলা, পানিফল, শুসনি শাক, আড়াইল।

চিত্র: শাপলা

চিত্র: পদ্ম

ঘ) **নিমজ্জিত বা ডুবন্ত উদ্ভিদ:** এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা ও ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন– কাঁটাঝাঁঝি, পাতাঝাঁঝি, পাতাশেওলা, নাজাস।

চিত্র: পাতাঝাঁঝি

চিত্র: নাজাস

চিত্র: কাঁটাঝাঁঝি

ঙ) **লতানো উদ্ভিদ:** এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এবং কাণ্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন– হেলেঞ্চা, কলমিলতা, মালঞ্চ।

চিত্র: মালঞ্চ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ বা উপযোগীকরণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো -

ক. নতুন পুকুর খনন

কোনো স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২ মিটার পানি থাকে। খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল ন্যূনতম ১.৫:২ রাখা উচিত। তবে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে ১:৩ করা নিরাপদ। অন্যথায় পুকুরের পাড় ভেঙে গিয়ে অল্প দিনে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পুকুর খননের স্থানে যদি উপরের মাটি ভালো ও উর্বর হয় তবে পুকুর খননের সময় আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। পুকুর খনন শেষ হলে পুকুরের তলায় বালু মাটির উপরে তা বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগে ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিতলের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। ঐ জায়গাটুকুকে বকচর বলে।পুকুরের তলা সমান অথচ একদিকে কিছুটা ঢালু করতে হবে। এতে পানি সেচ ও মাছ আহরণে সুবিধা হবে। নতুন পুকুর খননের পর দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে পাড়ের মাটি শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে পাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে ও বর্ষায় পাড়ের মাটি ক্ষয়ে যাবে না।

চিত্রঃ পুকুরের প্রস্থচ্ছেদ

খ. পুকুর প্রস্তুতকরণ বা মাছ চাষের উপযোগীকরণ

পুকুর প্রস্তুতি মাছ চাষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাছ পালনের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিলে মাছ স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে ও রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছ উৎপাদন লাভজনক হয়। পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপ গুলো নিম্নরূপ–

১. পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পাড় ভাঙা থাকলে মেরামত করতে হবে ও পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয় বা থাকলেও তা ছেটে দিতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যের আলো পড়বে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুর পুরানো হলে তলায় অতিরিক্ত কাদা জমা হয়। এ অবস্থায় ২০-২৫ সেমি কাদা রেখে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে সহজেই তা করা যায়। মাছ চাষের পুকুরে ৩-৪ বছর পর পর একবার শুকানো উচিত। পুকুর শুকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে।এতে করে পুকুরের তলা থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় দুর হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে।এরপর পুকুরের তলদেশ সমান করে নিতে হবে। পুকুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে মাছ ধরতে ও জাল টানতে সুবিধা হবে।

২. জলজ আগাছা দমন

পুকুর পাড়ে ও ভিতরে বিভিন্ন আগাছা যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা, হেলেঞ্চা, কলমি লতা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আগাছা পুকুরে দেওয়া সার শোষণ করে নেয়, সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয় এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন-রাক্ষুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ও মাছ ধরে খায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন-কপার সালফেট বা তুঁতে, সিমাজিন ইত্যাদি ব্যবহার করেও জলজ আগাছা দমন করা যায়। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা কাঙ্ক্ষিত নয়। গ্রাসকার্প, সরপুঁটি উদ্ভিদভোজী মাছ। চাষকালীন সময়ে পুকুরে এসব মাছ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ যেমন-শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি সরাসরি চাষের মাছ খেয়ে ফেলে। এছাড়া পুঁটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অচাষযোগ্য মাছ। এরা চাষযোগ্য মাছের জায়গা, খাদ্য, অক্সিজেন সবকিছুতেই ভাগ বসায়। এর ফলে চাষকৃত মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিচের যেকোনো পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও আবাদযোগ্য নয়,এমন মাছ দূর করা যায়-

ক) **পুকুর শুকিয়েঃ** পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুকুরের তলায় কাদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কড়া রোদে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

খ) **জাল টেনেঃ** পুকুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।

গ) **মাছ মারার বিষ ব্যবহার করেঃ** এক্ষেত্রে রোটেনন বা মহুয়ার খৈল ব্যবহার করা যায়। এসব দ্রব্য পুকুরে দিলে মাছের ফুলকার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ফলে মাছ দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সেমি গভীরতায় পানির জন্য শতক প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন অথবা ৩ কেজি মহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মোট পরিমাণকে তিন ভাগ করতে হবে। এক ভাগ দিয়ে কাই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে দিতে হবে। বাকি ২ ভাগ পানিতে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুকুরের পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে ধরে ফেলতে হবে। বিষ দেওয়ার পর ৭-১০ দিন পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না ও নতুন মাছ ছাড়া যাবে না। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করেও মাছ মারা যায় যেমন-ফসটক্সিন ট্যাবলেট। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা ঠিক নয়।

৪. চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকানোর পরে তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলায় চাষ দেওয়া হলে চাষের দিন চুন দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গলার পর ঠান্ডা হলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১) চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় ২) পানির P^H ঠিক রাখে ৩) পানির ঘোলাত্ব কমায় ও পানি পরিষ্কার রাখে ৪) মাছের রোগবালাই দূর করে এবং ৫) সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুকুরের বয়স ও পানির P^H মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন-এঁটেলমাটি, কাদামাটি ও লাল মাটির পুকুরে চুন একটু বেশি দরকার হয়। নিম্নে P^H মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

পুকুর প্রস্তুতির সময় চুন প্রয়োগের মাত্রা

পানির P^H মান	চুনের (পাথুরে) পরিমাণ (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫. সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে ফাইটোপ্লাংকটন ও জু-প্লাংকটন। সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-ফসফরাস, পটাশিয়াম পানিতে মিশে। এ পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন তৈরি হয়। আর ফাইটোপ্লাংকটনের উপর নির্ভর করে জু-প্লাংকটন তৈরি হয়। সার দুই প্রকার। ক) জৈব সার, যেমন-গোবর, কম্পোষ্ট, খ) অজৈব সার, যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

জৈব সার		অজৈব সার	
সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)	সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)
শুকনো গোবর	৫-৭ কেজি	ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
অথবা		টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম
কম্পোস্ট	৮-১০ কেজি	এমওপি	২০ গ্রাম

৬. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে এটি করা যায়।

ক) **সেক্কিডিস্ক:** ২০ সেমি ব্যাসযুক্ত টিনের একটি সাদা-কালো থালা (একে সেক্কিডিস্ক বলে) সুতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সেমি গভীরতায় থালা দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সেমি এর অধিক গভীরতায় সেক্কিডিস্ক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে খাবার অনেক কম।

খ) **হাত পরীক্ষা:** পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

গ) **গ্লাস পরীক্ষা:** একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস দ্বারা পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

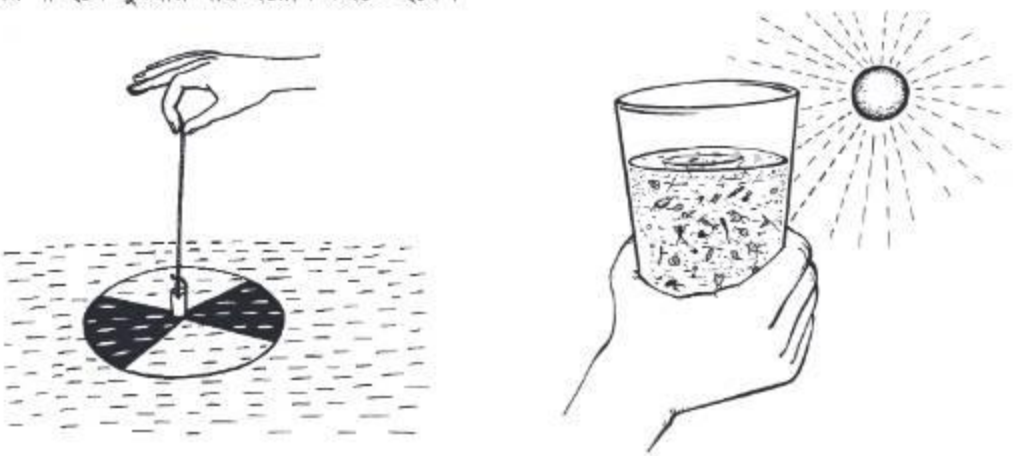

চিত্র: সেক্কিডিস্ক ও গ্লাস পরীক্ষা

৭. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

যে পুকুরে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে মাছ মারা হয়েছে, সেখানে পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুকুরে হাপা স্থাপন করে অথবা বালতিতে বা পাতিলে পুকুরের পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এ সময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

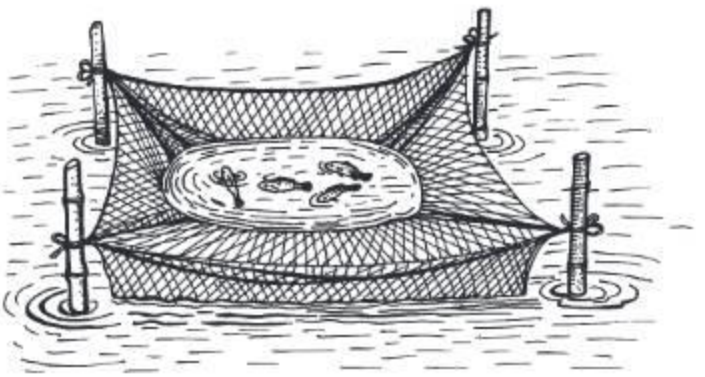

চিত্র : পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষকসহ পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরে গিয়ে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কি না তা পরীক্ষা করবে এবং খাতায় লিখে জমা দেবে।

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নার্সারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে/কাছাকাছি স্থানে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কিন্তু দূরবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে ৩ ভাগের ১ ভাগ পানি ও ২ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ জন্য পোনাভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে আস্তে আস্তে এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার পূর্বে শোধন করে নিলে পোনাগুলো কোনো ক্ষতিকারক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে মুক্ত হবে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে ও মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যাবে। বালতিতে বা পাতিলে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০টি পোনা আধা মিনিট গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে ৪-৫ বার শোধন করা যাবে। তাই পুকুরের জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।

চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

নতুন শব্দ: পিপিএম, রোটেনন, ফসটক্সিন ট্যাবলেট, সেক্কিডিস্ক

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাছের পুকুর/মৎস্য খামার পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়, যার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং আরও রয়েছে ১১৮৮১৩ বর্গ কি.মি. এর সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয় যেমন– নদ-নদী, বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, কাপ্তাই লেক, হাওর ও প্লাবনভূমি। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৩৮.৯০ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, বাঁওড় ও চিংড়ি খামার। এদের মোট আয়তন হচ্ছে ৮.১৫ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং ১৫ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

সুদূর অতীতে প্রাকৃতিকভাবে এদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ষাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮%-এ। বাকি উৎপাদনের ৫৭% আসে বিভিন্ন বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৫% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। মুক্ত জলাশয়ে শুধু উৎপাদনই নয়, সে সাথে মাছের জীববৈচিত্র্যও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ৯টি চরম বিপন্ন, ৩০টি বিপন্ন ও ২৫টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবিলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি (যেমন–পিপলা শোল, মহাশোল, বাঘাআইড়), আর যে প্রজাতি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবিলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। অন্যদিকে যে প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির মাছের উদাহরণ হচ্ছে- রানি, চিতল, টেংরা ইত্যাদি। আর ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হচ্ছে ফলি, আইড়, কাজলি, মেনি ইত্যাদি। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে কোনো জলাশয় বা এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন– কোনো হাওর, বিল বা নদীর কোনো অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক সময় উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে মাছ আহরণ যেন না করা যায় এজন্য গাছের ডালপালা, বাঁশ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে করে সেখানে মাছ নিরাপদ আশ্রয় পায়, মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে ও অবাধ প্রজনন ঘটাতে পারে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টির মতো অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের বা ঘোষণার মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।

২. মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।

৩. মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৪. মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৫. প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধি করা যায়।
৬. জলজ পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে।

নতুন শব্দ : চরম বিপন্ন প্রজাতি, বিপন্ন প্রজাতি, ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

দিনে দিনে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সাথে বাড়ছে মাছের চাহিদাও। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জেলেরা দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে প্রায় ছোট-বড় সব মাছই ধরছে। এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছও। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ক্রমান্বয়ে মাছ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এমনকি কিছু প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য যেন কমে না যায় বরং বৃদ্ধি পায় বা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে, এজন্য সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে 'মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন- ১৯৫০' প্রণয়ন করে। এটি সাধারণভাবে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ হলো -

১। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর : ক) জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া; খ) নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি)

মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের ইলিশ (যা 'জাটকা' নামে পরিচিত); গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের পাঙ্গাশ; ঘ) ফেব্রুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে (১২ ইঞ্চি) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা,পরিবহন বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

২। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা মা মাছ ধরা ও ধ্বংস করা যাবে না।

৩। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৪। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৫। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৬। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল (প্রচলিত নাম-কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৭। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ: সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় বছরের নির্ধারিত সময়গুলোতে কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৮। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ: ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতি বছর ১৫-২৪শে অক্টোবর (১-১০ই আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

৯। শাস্তি: (ক) প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা। (খ) পরবর্তীকালে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

নতুন শব্দ : জাটকা, কারেন্ট জাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
গৃহপালিত পাখির আবাসন

হাঁস-মুরগির আবাসন

পারিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মুরগি পালনের জন্য শুধু রাতে আশ্রয়ের জন্য ছোট খোঁয়াড় বা বাসস্থান তৈরি করা হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে এদের জন্য আবাসন বা বাসস্থান প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে পাখির বাসস্থান করা হয়ে থাকে। যথা-

১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
২। নিবিড়ভাবে যত্ন নেওয়া
৩। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা
৪। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা
৫। সহজে টিকা দেওয়া
৬। বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা
৭। চোরের হাত থেকে রক্ষা
৮। সহজে ডিম সংগ্রহ
৯। সহজে খাদ্য ও পানি সরবরাহ
১০। হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
১১। সহজে লিটার পরিষ্কার
১২। শ্রমিক কম লাগা ইত্যাদি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা, হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির ধাপগুলো লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির ধাপসমূহ

১। হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা
২। ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা
৩। হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা
৪। হাঁস-মুরগির ঘর তৈরি করা
৫। হাঁস-মুরগিকে প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া ইত্যাদি।

হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা : নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য হাঁস-মুরগির বাসস্থান বা ঘর তৈরি করতে হবে–

১। উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা
২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে দূরে

৩। ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা

৪। ভালো যাতায়াতব্যবস্থা

৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা

৬। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাসম্পন্ন স্থান

৭। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ ইত্যাদি থাকতে হবে।

ঘরের ডিজাইন

হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘর সবচেয়ে ভালো। হাঁস-মুরগির সংখ্যার উপর ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটারের মধ্যে হতে হবে। হাঁস-মুরগির ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণমুখী হতে হবে। ছাদের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের মুরগির ঘর বেশি দেখা যায়। যেমন–

১। গ্যাবল টাইপ

২। শেড টাইপ

শেড টাইপ : শেড টাইপ বা একচালা ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। খোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস-মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।

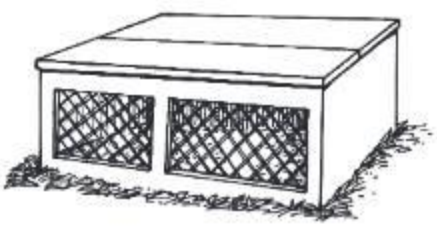

চিত্র : শেড টাইপ ঘর

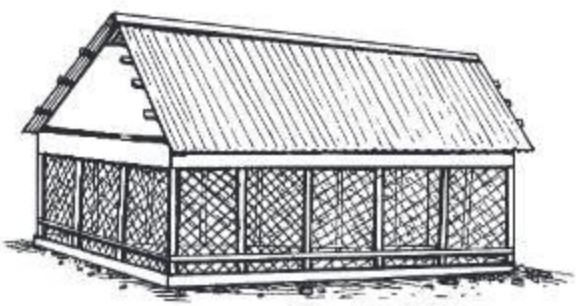

চিত্র : গ্যাবল টাইপ ঘর

গ্যাবল টাইপ : গ্যাবল টাইপ বা দোচালা ঘর তৈরিতে খরচ বেশি হয়। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু থাকে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী।

ঘরের ডিজাইন যে প্রকারের হোক না কেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মুরগির খামারে নিম্নলিখিত ঘরসমূহ থাকবে। যথা :

১। **বাচ্চার ঘর বা ব্রুডার ঘর :** এখানে সদ্য ফোটা বাচ্চাদের জন্ম থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান, টিকা, লিটার, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়।

২। **বাড়ন্ত হাঁস-মুরগির ঘর বা গ্রোয়ার ঘর :** এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

৩। **ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির ঘর :** এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগি ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

হ্যাচারি ঘর : যে খামারে বীজ ডিম থেকে ইনকিউবেটরের সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো হয়, তাকে হাঁস-মুরগির হ্যাচারি খামার বলে এবং যে ঘরে বাচ্চা ফোটে তাকে হ্যাচারি ঘর বলা হয়।

ব্রয়লার ঘর : যে খামারে মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগি পালন করা, হয় তাকে ব্রয়লার খামার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার ঘর বলা হয়। ব্রয়লার ঘরে মুরগিকে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঘর তৈরিকরণ

ছাদ বা চালা : টিন, অ্যাসবেস্টাস এবং করোগেটেড শিট দিয়ে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটের তৈরি ছাদ সবচেয়ে ভালো। গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামারে ছন ও উপযুক্ত গাছের পাতা ব্যবহার করা যাবে।

মেঝে : ঘরের মেঝে শুষ্ক রাখার জন্য হাঁস-মুরগিকে ইটের মেঝে বা মাচার উপর রাখা উত্তম।

দেয়াল : মুরগির ঘরের দেয়াল মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইট, তারের নেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। দেয়ালের উচ্চতা ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ০.৩ মিটার (১ ফুট) ও লেয়ারের ক্ষেত্রে ০.৬ মিটার (২ ফুট) পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। আর দেয়ালের উপরের অংশে তারের নেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে শীতের দিনে উপরের নেটের অংশটুকু চটের বস্তা বা ত্রিপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা : হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের দরজা আকারে বড় হওয়া উচিত।

জানালা : ঘরের লম্বালম্বি পাশে নেট থাকায় জানালা থাকে না। তবে, প্রস্থ পাশ দেয়াল দ্বারা বন্ধ থাকলে জানালা দিতে হবে।

হাঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গা : ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বয়স (মাস)	প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)		
	লিটার পদ্ধতি	খাঁচা পদ্ধতি	মাচা পদ্ধতি
০-১ (১ম দিন থেকে বয়স্ক পাখি)	০.০৫ - ০.২৮	০.০২ - ০.০৭	০.০২ - ০.১৯

নতুন শব্দ : আবাসন, শেড টাইপ ঘর, গ্যাবল টাইপ ও হ্যাচারি ঘর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির খাদ্য

দেহের বৃদ্ধি, ভরণপোষণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দানা শস্য ও এদের উপজাতসমূহ গৃহপালিত পাখির (হাঁস-মুরগির) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় খাতে। নিম্নে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

১। দানাশস্য ও এদের উপজাতসমূহ সতেজ ও মানসম্মত হতে হবে।
২। খাদ্যে পাখির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে।
৩। খাদ্য জীবাণু, ছত্রাক ও পরজীবী মুক্ত হতে হবে।
৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
৫। খাদ্য সহজপাচ্য হবে।
৬। খাদ্য খুব সুস্বাদু হতে হবে।
৭। খাদ্যের উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।
৮। খাদ্যকে যে কোনো প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে।
৯। খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।

চিত্র : ফিস মিল

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে পাখির রেশন তৈরি করা হয়। রেশন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় কোনো পশু বা পাখি দ্বারা গৃহীত খাদ্য। রেশন অবশ্যই পুষ্টি উপাদানে সুষম হতে হবে। যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন উপস্থিত থাকে তাকে সুষম রেশন বলে। সুষম খাদ্য বা রেশনের কাজ নিম্নে দেওয়া হলো।

১। খাদ্য বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
২। খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়।
৩। খাদ্য দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৪। দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।
৫। দেহ কোষের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।
৬। দেহের পানির সমতা রক্ষা করে।
৭। দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।
৮। দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।
৯। ডিম ও মাংস উৎপাদনে সাহায্য করে।

চিত্র : ঝিনুক/ শামুকের গুঁড়া

মুরগির খাদ্য

যেহেতু মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাই ডিমপাড়া মুরগি ও ব্রয়লার মুরগির জন্য পৃথক রেশন তৈরি করা হয়। ডিমপাড়া মুরগি বা লেয়ার মুরগির ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। লেয়ার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। বাড়ন্ত মুরগির রেশন : ৯-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ডিমপাড়া বা লেয়ার মুরগির রেশন : ২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত

ব্রয়লার মুরগিকে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয় :

১। ব্রয়লার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-২ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। ব্রয়লার গ্রোয়ার বা বাড়ন্ত বাচ্চার রেশন : ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ব্রয়লার ফিনিশার রেশন : ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত

খাদ্য উপকরণ : মুরগির খাদ্য তৈরিতে প্রধানত দানাশস্য ও এদের উপজাত ব্যবহার করা হয়। রেশন তৈরির জন্য দানাশস্য হিসাবে প্রধানত গম, ভুট্টা ও ভুসি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বসতবাড়িতে পারিবারিক মুরগি পালনে যেকোনো শস্যদানা যেমন, ধান, চাল, খুদ, ডাল, সরিষা ইত্যাদি মুরগিকে খেতে দেওয়া হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও বাজারদর বিবেচনা করে রেশন তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে পুষ্টি উপাদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
শর্করা	গম, ভুট্টা, ধান, চাল, চালের কুড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি।
আমিষ	শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল, রক্তের গুঁড়া ইত্যাদি।
স্নেহ	বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল যেমনঃ পাম তৈল, তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, ঝিনুক খোসা চূর্ণ, হাড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুদ্ধ জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

মুরগির খাদ্য গ্রহণ : লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মুরগির জাত, বয়স, তাপমাত্রা, খাদ্যের মান, বাসস্থান, খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	ডিমপাড়া মুরগি (গ্রাম/দিন)	ব্রয়লার (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১০	২৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২০	৬৫
তৃতীয় সপ্তাহ	২৫	১০০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩০	১৩০
পঞ্চম সপ্তাহ	৩৫	১৬০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৩৭	১৬৫
সপ্তম সপ্তাহ	৪০	----
অষ্টম সপ্তাহ	৪৫	----
বাড়ন্ত	৭০	----
পূর্ণ বয়স্ক	১১৫	----

কাজ : ১০০টি বাড়ন্ত লেয়ার মুরগি ৭ দিনে কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

মুরগির খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

গম বা ভুট্টাকে প্রথমে মেশিনে ভেঙে নিতে হবে। খৈলকেও ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। খাদ্য উপকরণ মাপার পাল্লা ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য তৈরির জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। প্রথমে গম বা ভুট্টা মেপে মেঝেতে ঢালতে হবে। তারপর চালের মিহিকুঁড়া ও গমের ভুসি, ভুসির উপর শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তার উপর খৈল ও সয়াবিন মিল ঢালতে হবে। এভাবে সবগুলো উপকরণ ঢালার পর খাদ্যের স্তূপটিকে একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার ঝিনুকের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া ও লবণ ঐ পিরামিডের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এবার আধা কেজি খাদ্য আলাদা করে নিয়ে তার মধ্যে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। এরপর মিশ্রিত ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পিরামিডের উপর সমস্ত খাদ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। সয়াবিন তৈল দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার খাদ্যের স্তূপটির ভিতরে বার বার হাত ঢুকিয়ে বা বেলচা দিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রিত এ খাদ্য বাদামি রঙের দেখাবে।

মুরগির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাধুনিক ফিড মিলে তৈরি করা হয়। মুরগির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে বাজারে ম্যাশ (পাউডার), ক্র্যাম্বল (দানা) ও পিলেট (বড়ি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকার বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রণ-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
গম/ভুট্টা ভাঙা	৪৫-৫৫
গমের ভুসি	৮-১২
চালের মিহিকুঁড়া	১০-১৫
খৈল	১০-১৫
শুটকি মাছের গুঁড়া	১০-১২
ঝিনুক চূর্ণ ও হাড়ের গুঁড়া	১.৫-৭
লবণ	০.৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ।

বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার মুরগির খাদ্য তালিকা

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন (%)	বৃদ্ধি রেশন (%)
গম/ভুট্টা ভাঙা	৫০	৫২
চালের মিহি কুঁড়া	১৪	১২
তিলের খৈল	১২	১০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৪	১২
সয়াবিন মিল	৮	৯
সয়াবিন তৈল	-	২
হাড়ের গুঁড়া	১.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০

কাজ :

শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০০টি ব্রয়লার মুরগির ১৪ দিনের প্রারম্ভিক রেশন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। **ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ :** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রা খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। **জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি :** পর্যাপ্ত পরিমাণ।

নতুন শব্দ : ভরণপোষণ, স্টার্টার রেশন, গ্রোয়ার রেশন, ফিনিশার রেশন, লেয়ার রেশন , ম্যাশ, ক্র্যাম্বলও পিলেট খাদ্য

হাঁসের খাদ্য

হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। এরা খাল, বিল, পুকুর, হাওর ও নদীর ছোট জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। হাঁস তৃণলতা এবং খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ খেয়েও ভালো উৎপাদন দিতে পারে। হাঁসের খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। হাঁস শুষ্ক খাদ্যের চেয়ে ভেজা খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। তাই এদেরকে সবসময় গুঁড়া ও ভেজা খাদ্য দেওয়া উচিত। প্রথম ৮ সপ্তাহ হাঁসকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। হাঁসের বাচ্চাকে জন্মানোর পর প্রথম কয়েক দিন হাতে তুলে খাওয়াতে হয় যাতে করে বাচ্চারা খাবার খাওয়া শিখতে পারে।

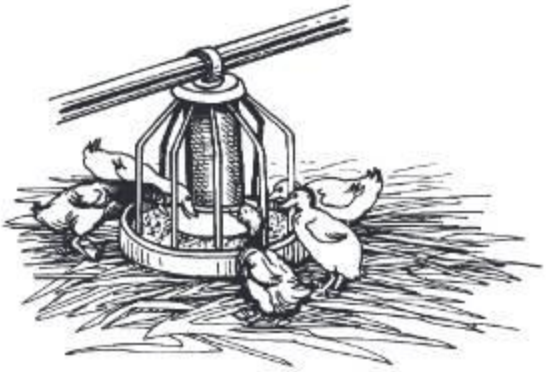

চিত্র : হাঁসের বাচ্চা খাদ্য খাচ্ছে

চিত্র : হাঁসকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসের রেশন তৈরি করা হয়। হাঁসের ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। হাঁসের বাচ্চার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। বাড়ন্ত হাঁসের রেশন : ৫-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ডিমপাড়া হাঁসের রেশন : ২০ সপ্তাহ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত

হাঁসের খাদ্য গ্রহণ : হাঁসকে বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান ও খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রেশন

বয়স	হাঁস (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৫
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩৫
পঞ্চম সপ্তাহ	৪০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৪৫
সপ্তম সপ্তাহ	৫০
অষ্টম সপ্তাহ	৫৫
বাড়ন্ত	৮৫
বয়স্ক	১২৫

কাজ : একটি বয়স্ক হাঁস ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত মোট কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রণ

উপকরণের নাম	উপকরণের শতকরা হার (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪৫-৫০
ধানের কুঁড়া	১০-১৫
খৈল	১০-১৫
সয়াবিন মিল	৮-১০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮-১০
শামুকের খোসা চূর্ণ	১.৫-৬.৫
খাদ্য লবণ	০.৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ
গবাদি পশুর খাদ্য

প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আবশ্যক। যা কিছু দেহে আহার্যরূপে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন- গম, ভুট্টা, ঘাস, খৈল, ভুসি ইত্যাদি।

প্রকারভেদ

প্রচলিতভাবে গবাদি পশুর খাদ্যকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আঁশ জাতীয় খাদ্য (Roughage feed)

২। দানাদার খাদ্য (Concentrate feed)

আঁশ জাতীয় খাদ্য

রাফেজ জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আঁশ (Fiber) এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। যেমন- যে কোনো খড়, প্রাকৃতিক বা চাষ করা সবুজ ঘাস, হে, সাইলেজ প্রভৃতি। রাফেজ জাতীয় ঘাস গবাদি পশু চারণভূমি থেকে পেয়ে থাকে বা ঘাস কেটে পশুকে সরবরাহ করা হয়। তুলনামূলক বিচারে লিগিউম জাতীয় ঘাস যেমন-আলফা-আলফা, কাউপি, খেসারি, মাসকলাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সাধারণ ঘাসের চেয়ে বেশি থাকে। সাধারণ ঘাসের মধ্যে ভুট্টা, নেপিয়ার, প্যারা, জার্মান প্রভৃতি প্রধান। এ জাতীয় ঘাসের সুবিধা হলো হেক্টর প্রতি এর ফলন অন্যান্য ঘাসের চেয়ে বেশি হয়।

দানাজাতীয় খাদ্য

যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে দানাদার খাদ্য বলা হয়। দুধাল বা মাংস উৎপাদনকারী গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শুধু আঁশজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

দানাজাতীয় খাদ্যকে নিম্নোক্ত উপায়ে ভাগ করা যায় -

ক) প্রাণিজ উৎস-ফিসমিল, ব্লাডমিল, ফেদার মিল প্রভৃতি।

খ) উদ্ভিজ্জ উৎস-গম, ভুট্টা, বার্লি, সরগাম, খুদ, খৈল, কুঁড়া, ভুসি প্রভৃতি।

এ ছাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যে খনিজ উপাদান হিসাবে কিছু ঝিনুকের গুঁড়া, ডিমের খোসার গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি, ভিটামিন হিসাবে পাতাজাতীয় সবজি, ভিটামিন- মিনারেল প্রিমিক্স এবং খাদ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু এন্টিবায়োটিক, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে গবাদি পশুর খাদ্যের প্রাপ্যতা ঋতু ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সবুজ ঘাস বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় এবং এগুলো যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে সারা বছর সবুজ ঘাসের অপর্যাপ্ততা থাকবে না।

দুই পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ক। সাইলেজ

খ। হে

সাইলেজ

রসালো অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে। বাণিজ্যিকভাবে সাইলোপিটে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয়। ভুট্টা, সরগাম, আলফা আলফা থেকে প্রস্তুতকৃত সাইলেজে বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়।

সাইলেজ ব্যবহারের সুবিধা

১। দীর্ঘদিন পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন থাকে।

২। সঠিক সময়ে ঘাস কেটে সেগুলো কার্যকরী খাবার হিসাবে গবাদি পশুকে সরবরাহ করা যায়।

৩। এতে হে-এর তুলনায় কম পুষ্টিমান অপচয় হয়।

৪। সাইলেজ তৈরির ফলে ঘাসের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।

৫। সাইলেজ ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়াতেও তৈরি করা যায়।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরি করা গেলেও ভুট্টা ও আলফা-আলফা দিয়ে তৈরি সাইলেজ অত্যন্ত উন্নত মানের হয়। ভুট্টার সাইলেজ গবাদি পশু বিশেষ করে দুধাল গাভীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভুট্টার সাইলেজে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকে।

ভুট্টার গাছের গোড়ায় কালো দাগ আসার সাথে সাথে সাইলেজ প্রস্তুতের জন্য ভুট্টা কাটার উপযোগী হয়। এ সময়ে ভুট্টা গাছের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৩০-৩৫% হয়। ভুট্টা গাছগুলোকে ভূমি থেকে ১০-১২ সেমি উঁচুতে কাটা হয়। এরপর এগুলোকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। টুকরা করা ঘাস গর্তে বায়ুরোধী অবস্থায় রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে গর্তের পরিবর্তে পলিথিন দিয়ে তৈরি বড় আকারের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। টুকরা করা গাছগুলো ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে বাতাস চলাচল করতে না পারে। এভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো পুষ্টি উপাদান না হারিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময়ে পশুকে সরবরাহ করা যায়।

সাইলেজ তৈরির সময় গাছ টুকরা করা ও বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্য –

১। গাঁজনের জন্য বেশি পরিমাণে গাছের সুগার অবমুক্ত হতে পারে।

২। বায়ুরোধী হলে সুষ্ঠুভাবে গাঁজন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়।

কোনো খাদ্য উপাদানের অপচয় ব্যতিরেকে ঘাস সংরক্ষণের জন্য এটা একটা কার্যকর ব্যবস্থা। সাইলেজ বায়ুরোধী পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অক্ষুণ্ন রেখে ক্ষতিকর ইস্ট, মোল্ড, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

হে

হে অতি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত খাদ্য, যা সারা বছর গবাদি পশুকে সরবরাহ করা যায়। সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে এর আর্দ্রতা ২০% বা তার নিচে নামিয়ে এনে হে প্রস্তুত করা হয়। হে তৈরির জন্য এক বা একাধিক লিগিউম জাতীয় ঘাস চাষ করা যায়। লিগিউম ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে। লিগিউম গাছের মূলে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ধরে রাখে যা প্রোটিন গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে লিগিউম ছাড়াও সাধারণ ঘাস দিয়ে হে তৈরি করা যেতে পারে।

গুণগত মানের হে-এর বৈশিষ্ট্য

হে এর খাদ্যমান ঘাসের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। হে-এর গুণগতমান ঘাসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পাতার পরিমাণ, ঘাসের রং প্রভৃতি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

১। হে এর জন্য ব্যবহৃত ঘাস পাতা সমৃদ্ধ হতে হবে। হে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুষ্ক হতে হবে। পাতার পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে থাকে।

২। হে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ বিদ্যমান থাকে। বেশি আর্দ্রতা থাকার কারণে বা অত্যধিক তাপের কারণে হে বাদামি বর্ণের হতে পারে যেটা পুষ্টি উপাদান কমে যাওয়ার নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩। হে আগাছামুক্ত হতে হবে।

৪। হে মোল্ড ও ধুলা বালিমুক্ত হতে হবে।

৫। হে তে খাওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ থাকতে হবে।

হে তৈরির পদ্ধতি

গাছ কাটার সময় : হে তৈরির জন্য সঠিক পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়ে গাছ কাটতে হবে। যত কম বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত বেশি হবে। যত বেশি বয়সে গাছ কাটা হবে, হে এর গুণগতমান তত কমে যাবে। তবে ফুল আসার সময় কাটাই উত্তম।

সঠিকভাবে শুকানো : হে তৈরির সময় গাছকে সঠিকভাবে শুকাতে হবে যাতে করে মোল্ড মুক্ত ও অতিরিক্ত তাপমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। গাছগুলোকে দ্রুত শুকাতে হবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো পরিহার করতে হবে যাতে করে ভালো মানের হে এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা যায়। গাছ কেটে রোদে উলটপালট করে এমনভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে অতিমাত্রায় পাতা ঝরে না যায়। সবুজ ঘাসে সাধারণত

৭৫-৮০ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। যেখানে ভালো মানের হে তে সর্বোচ্চ ২০-২৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। রোদে শুকানোর সময় বৃষ্টির পানিতে ভেজানো যাবে না।

হে সংরক্ষণ : হে অবশ্যই শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজ : ১। শিক্ষার্থীরা আঁশজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে শুধু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে গবাদি পশু পালন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে জমা দেবে।

২। শিক্ষার্থীরা সাইলেজ তৈরি করবে এবং এর ধাপগুলো লিখে জমা দেবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আলুর কোন রোগ ব্যাপক ক্ষতি করে?

ক. আলুর মড়ক রোগ
খ. ঢলে পড়া রোগ
গ. কাণ্ডপচা রোগ
ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ

২. পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমপক্ষে কত ভাগ হওয়া প্রয়োজন?

ক. ২ মি গ্রাম/লিটার
খ. ৩ মি গ্রাম/লিটার
গ. ৫ মি গ্রাম/লিটার
ঘ. ৭ মি গ্রাম/লিটার

৩. গোল আলুর মড়ক রোগ দেখা দেয়–

i. নিম্ন তাপমাত্রায়
ii. ঘন কুয়াশায়
iii. অতিরিক্ত বৃষ্টির সময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফরিদা বেগম তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের ১৫ শতকের একটি পুকুর মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তার পুকুরে উপযুক্ত মাত্রায় সার ও চুন প্রয়োগ করেন। পোনা ছাড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ পোনাই মারা গিয়েছে।

৪. ফরিদা বেগমের পুকুরে কত কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে?

ক. ২০ কেজি খ. ২৫ কেজি

গ. ৩০ কেজি ঘ. ৩৫ কেজি

৫. পুকুরের পোনা মারা যাওয়ার কারণ–

i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য

ii. ক্ষতিকারক পরজীবীর আক্রমণ

iii. অক্সিজেনের ভিন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কনক বড়ুয়া পশু পালনের জন্য চারণ ভূমি তৈরি করেছেন। বর্ষা মৌসুমে তার চারণ ভূমিতে ব্যাপক হারে ঘাস উৎপাদন হলেও শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের চাহিদা মেটাতে পারেন না। এজন্য তার পশুগুলোর সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য কাঁচা ঘাসের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। এরপর কনক বড়ুয়া তার প্রতিবেশী অনেককেই উক্ত পদ্ধতিতে গো-খাদ্য সংরক্ষণের উদ্বুদ্ধ করলেন।

ক. গো-খাদ্য কাকে বলে?

খ. দানাজাতীয় খাদ্য কীভাবে পশুর উৎপাদন বাড়ায় ব্যাখ্যা করো।

গ. কনক বড়ুয়ার গৃহীত পদ্ধতিটির তৈরি কৌশল ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কনক বড়ুয়ার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন করো।

২. বেকার যুবক মহিবুল্লাহ বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৫০ শতাংশের পুকুর সংস্কার করে কার্প জাতীয় মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পর মাছের পোনা মজুদ করেন। মজুদ-পরবর্তী সময়ে সেক্কিডিস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করেন। বর্তমানে সফল মৎস্য চাষি হিসাবে তিনি এলাকায় পরিচিত।

ক. মাছের চাষের জন্য পুকুরের পানিতে প্রতি লিটারে কী পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন?

খ. চুন পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করে ব্যাখ্যা করো।

গ. মহিবুল্লাহ তার পুকুর প্রস্তুতির সময় কতটুকু গোবর প্রয়োগ করেছিল হিসাব করে দেখাও।

ঘ. মহিবুল্লাহর পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি অর্থের অপচয় রোধ করে বেশি উৎপাদনে সহায়ক বিশ্লেষণ করো।